ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
অবিরাম নাট্যচর্চার নবম বছরে সকলকে
শারদীয়ার নাট্য শুভেচ্ছা
নির্মল শিকদার (সম্পাদক)
৯৮৩০০৪৯৭৩৮

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ২৮ ভাদ্র ১৪২১ • রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ • ২.০০ টাকা

sebakpatrika@gmail.com

Loose Your Weight
and Feel Great
We can show you
How
Contact-9331898629

আপনাদেরই হাসপাতাল

গান্ধী সেবাসদন

ডাঃ টি কে চট্টরাজ

মানব সভ্যতার প্রাথমিক শর্তই হলো সমাজের প্রতিটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যেরও নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত করা। আমি আমার এই লেখাতে মূলত প্রাধান্য রাখবো স্বাস্থ্য-কেন্দ্রিক। অপ্রয়োজনীয়, তবুও বলছি, স্বাস্থ্য আজ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সারা বিশ্বেরই দরবারে সুস্থ-সবল সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে। কিন্তু আপসোস, সকলেরই কম-বেশি জানাও আছে যে, বর্তমান সমাজে স্বাস্থ্যও একটি ক্রয়যোগ্য ‘পণ্য’ হিসেবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। মাল্টি ন্যাশনাল, ট্রান্স-ন্যাশনাল পুঁজির প্রভাবই হোক আর যে কোনও অজ্ঞাত কারণেই হোক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কিন্তু এই ‘পণ্য’ বিবেচনার বিরোধিতায় অতীব সক্রিয়। কম-বেশি হলেও আজও আমাদের দেশের সরকারি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ব্যাপক মানুষের কাছে সরকারি হাসপাতালের বিকল্প আজও তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই সাধারণ জনগণ এই আর্থসামাজিক সঙ্কটের মধ্যে অনেকটাই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি খানিকটা খানিকটা নানান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকাও উল্লেখ করার মতোই। অল্প হলেও তাদের ক্ষমতানুযায়ী কিছু স্বাস্থ্য-পরিষেবা সমাজের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ এরকমই একটি সংস্থা। যার কিনা বহুবিধ সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিষয়ক ক্রিয়াকর্মের বিশেষ ধারাবাহিকতা আছে। এই সংস্থা তাদের সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী এক ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালায়। গত কয়েক বছর ধরে সংস্থার সদস্যগণ একটু বৃহৎ চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। কি করে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের পাশে নিজেদের নিয়ে আসা যায়! তারই ফলস্বরূপ জন্ম নিতে চলেছে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে একটি পরিপূর্ণ হাসপাতাল গান্ধী সেবা সঙ্ঘ স্কুল সংলগ্ন সঙ্ঘের এক বিঘা খালি জমিতে। উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র পাতিপুকুর, দক্ষিণদাঁড়ি, লেকটাউন, শ্রীভূমির গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের রাজ্যের মানুষের, বিশেষত আর্থিকভাবে অনগ্রসর অংশের মানুষের স্বাস্থ্যের পরিষেবা তুলনায় অনেকটা সহজসাধ্য করে দেওয়া।

ইতিহাস সাক্ষী থেকেছে সর্বদাই। যেকোনও মানব কল্যাণমূলক বৃহৎ কর্মের পেছনেই কোনও না কোনও বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য থেকেছে। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে প্রায় নির্মিত এই হাসপাতালও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বৃহৎ মহৎ ভাবনার বাস্তবিক রূপও কিন্তু সম্ভব হতে চলেছে আমাদের বিধাননগর বিধানসভার বিধায়ক মাননীয় শ্রী সুজিত বসু মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। তাঁর এই প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় মেলবন্ধনেই এই হাসপাতালটির বাস্তব রূপায়ণে আমরা সবাই সহযোগী ও সাক্ষী।

বর্তমান হাসপাতালটিতে যেমনভাবে চিকিৎসা পরিষেবার দিকও থাকবে, তেমনি রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে একটি সচেতন আন্দোলন/ক্ষেত্র তৈরি করারও ভূমিকা থাকবে। শুরুতে হাসপাতালটির দ্বিস্তরীয় (Secondary) পরিষেবা থাকলেও ভবিষ্যতে এটাকে ত্রিস্তরীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও আছে। প্রথমদিকে প্রায় ৮০ বেডের পরিকল্পনা থাকলেও পরে যে তা ধাপে ধাপে বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। এখানে যেমন সাধারণ রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্তও থাকবে, তেমনি আবার অতি আধুনিক উন্নতমানের যথা Neuro Surgery, Dialysis/Orthopedic (Secondary) Care-ও থাকবে। এখানে ICCU/ITU এবং পেসমেকার বসানোর বন্দোবস্তও থাকবে। শেষে বলি, যে উদ্দেশ্যে এই হাসপাতালটি গড়ে উঠছে তাহল, সমাজে সর্বস্তরের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন থাকবে ঠিক তার পাশাপাশিই বিশেষ নজর দেওয়া হবে আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর জনমানুষের ওপরেই।

আবারও বলি, সাধারণ মানুষজন যখন তাঁদের নিজের এবং পরিজনদের চিকিৎসা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন, আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তখন গান্ধী সেবা সঙ্ঘের অবাণিজ্যিক এই আধুনিকমানের হাসপাতালে মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে এবং এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

নির্মীয়মান গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল। ছবি: গৌতম সাহা

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
Leader in Solar PV Engineering
MNRE, Govt. Of India Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

আমার শুভেচ্ছা রইল
গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মুখপত্র ‘সেবক’ পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। দীর্ঘকালের এই সমাজসেবী সংস্থার বহুমুখী পরিষেবা আরও প্রসারিত ও প্রচারিত হোক — এই কামনা করার পাশাপাশি, সম্প্রতি যে বিশাল প্রকল্প, ‘গান্ধী সেবা সদন’ হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে, অচিরেই সেখানে জনসাধারণের স্বল্প ব্যয়ে সুচিকিৎসার সুযোগ মিলবে বলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।
ধন্যবাদান্তে,
সুজিত বসু
বিধায়ক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ইতিবৃত্ত

(স্থাপিত ১৯৪৬)

উৎপল ঘোষ

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। কলকাতার উত্তর-পূর্বে এই শ্রীভূমি-দক্ষিণদাঁড়ি অঞ্চল ছিল মূলত ছোট শিল্প ও কলকারখানা ভিত্তিক শ্রমিক, নিম্নবিত্ত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের বসবাসের স্থান।

প্রাক-স্বাধীনতা বর্ষে দেশভাগের প্রতিবাদে চলছে আন্দোলন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। দেশবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী তখন বেলেঘাটায় অনশনরত। তেমনই এক সঙ্কটকালে কিছু উৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অঞ্চলের শিশু ও কিশোরদের মধ্যে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে দক্ষিণদাঁড়ি রোডের 'পাথরকল' (ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং, এখন যার অস্তিত্ব নেই) ১৯৪৬-এ প্রাক্কালে একটি পাঠশালা শুরু করেন। তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সফল করতে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৯৪৯ সালে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত দাঁ-পরিবার একটি 'ট্রাস্টি বডি' গঠন করে আনুমানিক ২ বিঘে জমি দান করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর 'শিক্ষা-সেবা-স্বনির্ভরতা'র আদর্শে গঠিত হল 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ', দক্ষিণদাঁড়ি। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম যশোদাকুমার মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, রামদেব মিশ্র, গিরিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ দত্ত, অনন্তলাল দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র দাঁ প্রমুখ মহান মানুষেরা গঠন করেন এই গান্ধী সেবা সঙ্ঘ।

তৎকালীন বিখ্যাত ব্যবসায়ী দত্ত পরিবার ও লাহা পরিবারের ও বহু সাধারণ মানুষজনের আর্থিক অনুদানে নির্মিত হল 'গান্ধী সেবা বুনিয়াদি বিদ্যালয়'।

সেই সময়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যেত ম্যালেরিয়া ও অপুষ্টিজনিত নানাবিধ রোগের প্রকোপ। তাই অচিরেই একটি 'প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, যা আজও চলছে।

১৯৫১-৫২ সালে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, দক্ষিণদাঁড়ি একটি অরাজনৈতিক জনকল্যাণ সমিতি রূপে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে সরকারি নথিভুক্ত হয়। প্রদত্ত জমিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এরই সঙ্গে 'অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র', বহুমুখী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি আজও চলছে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি সরকারি অনুমোদন ও আর্থিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ১৯৬৯ সালে। বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাইস্কুল স্তরে উন্নীত হওয়ার সরকারি অনুমোদন পায় ১৯৭১ সালে। তৎকালীন উদ্যোক্তা ও কার্যকরী সমিতির সদস্যদের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও অর্থ সংগ্রহের দ্বারা বিদ্যালয় ভবনের দ্বিতল নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় ১৯৭৭ সালে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করেন। ওই বছরেই সঙ্ঘের পরিচালনায় মহিলাদের 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্রের' সূচনা হয়।

১৯৭১ সালে তৎকালীন সম্পাদক পীযূষচন্দ্র ঘোষের আকস্মিক মৃত্যুর পর মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা সঙ্ঘের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সঙ্ঘের কর্মপরিধি ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। শুরু হল সঙ্ঘের এক নতুন অধ্যায়।

আটের দশকের গোড়ার দিকে তৎকালীন কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগ নিলেন সঙ্ঘের নিজস্ব ভবন নির্মাণের। চালু হল এতদঞ্চলে প্রথম 'সাধারণ গ্রন্থাগার'। যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টা এবং অর্থসাহায্যে সঙ্ঘ ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন স্বর্গীয় অধীরকুমার বোস, গৌরাঙ্গ বণিক, মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র দত্ত, জে এস বাচওয়াত, হেমেন্দ্রলাল কুণ্ডু, প্রণবচন্দ্র দাঁ, পীযূষ ঘোষ, আর এল জয়সোয়াল প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন 'পিয়ারলেস জেনারেল ফিনান্স', 'অফিসার্স অফ ইস্টার্ন পেপার মিল' প্রভৃতির আর্থিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য। অবশেষে ১৯৮৪ সালে সঙ্ঘ ভবনের একতলা নির্মাণ সম্পন্ন হয়। তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় উমাশঙ্কর দীক্ষিত সঙ্ঘ ভবনের দারোদ্ঘাটন করেন। প্রখ্যাত ভাস্কর সুনীল পাল মহাশয় ভবনের সামনে স্থাপিত আবক্ষ গান্ধী মূর্তিটি দান করেন। এরপর নবনির্মিত ভবনে শুরু হয় বহুমুখী পরিষেবা। স্থানীয় কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহযোগিতায় শুরু হল দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র ১৯৮৬ সালে। আগে থেকেই প্রচলিত ছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিভাগে মহিলাদের সেলাই ও বস্ত্রশিল্প প্রশিক্ষণ। যোগব্যায়াম ও ক্যারাটে প্রশিক্ষণও শুরু হয় ওই সময়ে। 'Oxfam' ও 'Lions Club'-এর সৌজন্যে সন্নিহিত বিধান কলোনিতে শুরু হল Outdoor Clinic ও Community Health Service, ১৯৮৭ সালে। শিশুদের জন্য 'Toy Library' স্থাপিত হয় Lions Club, Lake Gardens-এর সৌজন্যে ১৯৯০-৯১ সালে।

> **বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির মেলবন্ধনেই জীবনের পূর্ণতা। হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক-চিত্রকলার মাধ্যমে**

বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির মেলবন্ধনেই জীবনের পূর্ণতা। হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক-চিত্রকলার মাধ্যমে। তাই ইতিপূর্বেই 'গীতিমালঞ্চ' নামে সঙ্গীত শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রতি মাসে নিয়মিত 'পাঠচক্রের' আসর বসিয়ে। এরপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণে 'ফটোগ্রাফি'র প্রশিক্ষণ শুরু হয় ১৯৯১ সালে। শিশুদের শেখার বিকাশের উদ্দেশ্যে 'শিশুবিকাশ কেন্দ্র' চালু হয় ১৯৯২ সালে। প্রতি রবিবার সকালে শিশুদের অঙ্কন, আবৃত্তি ও সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন অলক ঘোষ মহাশয়। সঙ্ঘের মুখপত্র 'সেবক'-এর প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৯৪ সালে। সাহিত্যিক সুশান্ত পাল পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। স্থানীয় পৌরপিতা শ্রী সুজিত বসুর আর্থিক অনুদানে এবং ড. হিরন্ময় সাহার কারিগরি পরামর্শে 'কম্পিউটার প্রশিক্ষণ' চালু হয় ১৯৯৫ সালে।

নয়ের দশকের গোড়ার দিকে সঙ্ঘের 'ট্রাস্টি বোর্ড'-এর কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রয়াত মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক উত্তম ঘোষ। এরপর ১৯৯২-৯৩ সালে সাধারণ সম্পাদিকা হলেন শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জি। শ্রদ্ধেয় মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা অসুস্থ হওয়ায় কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মণি চক্রবর্তী মহাশয়। তখন সাধারণ সম্পাদক হলেন প্রয়াত রামকৃষ্ণ সিংহ (১৯৯৪-৯৬)। এরপর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উৎপল ঘোষ। তখন সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শ্রী রঘুনাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জি এবং ড. হিরণ্ময় সাহা।

সঙ্ঘের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে (১৯৯৬-৯৭) কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন, (১) দ্বিতলে তিনটি ঘর নির্মাণ, (২) স্বল্প ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য 'Specialist Clinic' এবং (৩) সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা প্রকাশ। ওই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে যাঁদের আর্থিক অনুদান ও আন্তরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন প্রাক্তন সাংসদ নির্মলকান্তি চ্যাটার্জি, মাননীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রী সুজিত বসু, বর্ষীয়ান সমাজসেবী প্রণবকুমার দাঁ ও মণি চক্রবর্তী প্রমুখ।

নানাবিধ কাজের সঙ্গেই স্থাপিত হল চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র, ১৯৯৮ সালে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে তৎকালীন সহ-সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহার উদ্যোগে 'Silk Screen Printing'-এর প্রশিক্ষণ শুরু হয় ওই বছরেই।

প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গুহঠাকুরতা পরিবারের যোগাযোগ সূত্রে এবং শ্রী প্রবীর গুহঠাকুরতার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও যোগাযোগের ফলে ফ্রান্সের একটি সংস্থা 'Planet Coeur' ১৯৯৫ সাল থেকে সঙ্ঘের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে ও সম্প্রসারণের জন্য নিয়মিত বার্ষিক অনুদান করে থাকে। ওই প্রাপ্ত অর্থ সঙ্ঘের চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষ সাহায্য করে। ১৯৯৮-৯৯ সালে Lions Club-এর সৌজন্যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

সঙ্ঘের দীর্ঘ তিন দশকের কর্ণধার তথা রূপকার সভাপতি মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতার স্মৃতিরক্ষার্থে গঠিত হয় 'মাণিক্যমঞ্চ', ২০০০ সালে। মাণিক্যমঞ্চ উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে। খ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীমতি ডলি বসুর পরিবেশনায় নাটক মঞ্চস্থ হয়। সঙ্ঘের নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এতদাঞ্চলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এই মঞ্চে তাঁদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

(ক্রমশ)

ঠিকানা !

উৎপল সরকার

এখনও একটা সংলাপ কানে বাজে।

বিকেলে আমার স্ত্রী বারান্দায় বসেছিলেন। রাস্তা দিয়ে পথচারী প্রতিবেশী যাঁরাই যাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গেই ওর কথাবার্তা, গল্পগুজব চলছে। ওঁদেরই মধ্যে দু'জন জয়া সিনেমা হল থেকে সিনেমা দেখে ফিরছিলেন। আমার স্ত্রী ওঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর এল— সিনেমা দেখে এলাম। জানো তো! বৌদি সিনেমাটা এমনিতে ভাল, কিন্তু কান্নার দৃশ্যগুলো ঠিক জমাতে পারেনি।

— তাতে কী ক্ষতি হল। সিনেমাটা তো ভাল।

— না মানে, ঠিকমতো কাঁদতে পারলাম না।

— ঠিকই বলেছ। ডিরেক্টর সাহেবরা দর্শকদের মনের খবরই রাখেন না।

একটু ভেবে দেখুন সিনেমা থেকে মানুষের চাহিদা কত রকমের হতে পারে!

অনেক দিন আগেকার আর একটা সংলাপ মনে পড়ে। স্কুলের গণ্ডি তখনও পার হইনি, একজন হন্তদন্ত হয়ে আড্ডায় এল। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, সপ্তপদী দেখে এলাম।

— ক'বার হল?

— সাতবার। আজ গানটা কমপ্লিট হল। দু-একটা সুর ঠিক আসছিল না। সবটা তোলা হয়ে গেছে। দারুণ লাগছে! এখন গাইতে পারব।

আমার বন্ধুটি গাইতে পারত। পাড়ার ফাংশানে, গান জমিয়ে দিত। অতএব এক একটা ছবি কয়েকবার করে না দেখলে ওর গান শেখা হত না। তখনকার দিনে (১৯৬২-৬৩ সাল হবে) কথায় কথায় গানের রেকর্ড বা ক্যাসেট তো পাওয়া যেত না, কাজেই সিনেমা বারবার দেখে অনেকে গান শিখে নিত।

এবার আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ফাদার গাঁস্তো রোবের্জ ছিলেন, বলতে গেলে, আমার চলচ্চিত্র শিক্ষকদের মধ্যে একজন। তিনি বাংলাদেশে একটা সেমিনারে গিয়েছিলেন।

সিনেমা বিষয়ক আলোচনাসভা। একজন বক্তা তখনকার সুপার ডুপার হিট ছবি 'বেঁদের মেয়ে জ্যোৎস্না'র কথা উল্লেখ করলেন। এক-একজন দর্শক ছবিটা দশ-বারো বার করে দেখেছেন। কিন্তু মজার বিষয় হল, রোবের্জ সাহেব যখন সংগঠকদের কাছে ছবিটা দেখার অনুরোধ রাখলেন, তখন সংগঠকরা সবাই লজ্জা পেয়ে গেলেন। দেখাতে রাজি হলেন না। কিন্তু চলচ্চিত্র গবেষক হিসেবে ছবিটা ওনার দেখার দরকার বোঝানোর ফলে ওঁরা ব্যবস্থা করলেন। ছবিটার গুণগত মান নিয়ে হাজার একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু ছবিটা যে দর্শকধন্য সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

এরকম অজস্র রি-অ্যাকশন শট তুলে ধরা যায়। ওপরের ক'টা অভিজ্ঞতার কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হল এই আপামর দর্শকশ্রেণীর চাহিদার রকমফের— সে যে কত বিচিত্রগামী তার হিসাব মেলাভার। সিনেমার নির্মাতারা তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কোনটা ভাল খাবে! সত্যি এই ভাষাতেই কথা হয়। ওরাই তো দর্শকদের অভিরুচিকে সুরসুরি দেওয়ার জন্য প্রথম যেদিন কলকাতার বুকে ছবির প্রদর্শন হল, তখন মজাদার এক বিজ্ঞাপন দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত রঙ্গালয় স্টার থিয়েটারে ছবিটা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন মিঃ স্টিফেনসন। তারিখটা ছিল এপ্রিল '৯৭। বিজ্ঞাপনটা ছিল—

'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! বায়স্কোপ! আসুন! দেখুন! যাহা কেহ কখনও কল্পনা করেন না, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ, জীবজন্তু, জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাটিয়া, ছুটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে! চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।'

মানুষের চাহিদার যে স্বপ্ন সেদিন রচনা হয়েছিল তা ডালপালা মেলে বিস্তার লাভ করে মহিরুহে পরিণত হবে তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! লাখো মানুষের লাখো স্বপ্ন। সিনেমাকে হতে হবে সেই স্বপ্ন পূরণের যন্ত্র। কেউ চান ঝাড়পিট, কেউ চান গুলি-গোলা-বন্দুক, কেউ চান ডায়ালগ। জবরদস্ত ডায়ালগ (মারব এখানে লাস পড়বে শশ্মানে), কেউ চান নাচ-গান, কেউবা সঙ্ঘাত, নাটকীয়তায় ভরপুর, কেউ চান গতি, কেউবা কাহিনীর বুনোটের কথা বলেন। কেউবা চান সুস্থ-সুন্দর শৈল্পিক ছবি। নয়া বাস্তবতা, পরা বাস্তবতা, অস্তিত্ববাদ নিয়ে যে ছবি, তার চাহিদাও কম নয়।

বেচারা সিনেমা! কেন যে ছাই তার জন্ম হল। বেশ তো চলছিল— লুমিয়ের ব্রাদাররা এই কেলেঙ্কারিটা না করলেই চলছিল না। বাংলা তথা ভারতের বুকে সেন ভাইয়েরাও (হীরালাল সেন, মতিলাল সেন) পাগলামিটা না করলেই কি চলছিল না। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোলপাড় করা অবস্থা। বিদেশি লোকগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ ওরা একটু বেশি রকমের শিক্ষিত, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের গন্ধ থাকলে তো ওরা ছুঁকছুঁক করে। টেকনোলজির কথা উঠলে ওরা লাফ দিয়ে ওঠে। কাজেই ওদের কথা আলাদা। পোর্টার, মিলি, গ্রিফিথ, আইজেনস্টাইন, ডবজেঙ্কো অনেক নাম, অনেক ব্যাকরণ, অনেক গল্প। আমাদের দেশে ওসব ঝামেলার কী দরকার ছিল বলুন তো। বেশ তো বাপ-ঠাকুর্দা আইনের ব্যবসা করছিলেন, সেসব ছেড়েছুঁড়ে আই এসসি পাস করতে না করতেই কী দরকার ছিল বাংলার ঠান্ডা মাটিকে গরম করার। হীরালালকে পেলে সে-কথাই জিজ্ঞাসা করতাম।

নিদেনপক্ষে সুচিত্রা সেনকে পেলেও জিজ্ঞাসা করতাম— আপনার মাতুলালয় সম্পর্কে হীরালালকে পাগলামি থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না? উনি হয়ত হেসে জবাব দিতেন, হীরালাল না জন্মালে আমারও তো জন্ম হত না। সত্যি তাই। একটু অবাক কাণ্ডই বটে। প্রথম নির্বাক ছবি বিল্বমঙ্গল ('১৯) যদি না হত, প্রথম সবাক ছবি জামাইষষ্ঠী ('৩১) যদি না হত, তাহলে কোথায় থাকতেন আমাদের উত্তম, সুচিত্রা, সৌমিত্র, সাবিত্রী, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা। কোথায় পেতাম গুপি গায়েন বাঘা বায়েন, মেঘে ঢাকা তারা, ভুবনসোম। কোথায় থাকত অটোগ্রাফ, ইচ্ছে, ভূতের ভবিষ্যৎ। তিতলির মতো মিষ্টি ছবি, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার, মনের মানুষ। কোথায় থাকত শত্রু বা MLA ফাটাকেষ্ট?

কাজেই ভালই হয়েছে বলুন। বাংলার মাটিতে একটা গোটা শিল্পের (যে অর্থেই ধরুন, সব অর্থেই প্রযোজ্য) গোড়াপত্তন করে দিয়ে গেছেন স্বর্গীয় হীরালাল সেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ করেকর্মে খাচ্ছেন আর কোটি কোটি লোক আনন্দ উপভোগ করছেন।

যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটা এবার শেষ করার দরকার। সেই চাহিদা, সেই স্বপ্ন— তাদের কী হবে? পূরণ হবে কী করে? পূরণ তো হচ্ছে। নানান ছবি নানাভাবে স্বপ্ন পূরণ তো করছে। অযথা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানোর দরকারটা কী বাবা! একে ঝগড়া বলে না, বলে বিতর্ক।

সত্যি কি সিনেমা স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার? পাঠকের কাছে বিনীতভাবে জানার ইচ্ছে? গল্প-উপন্যাস কি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করে? চিত্রকলা, নাটক, গান এগুলোও কি স্বপ্ন পূরণ করে?

যদি এর উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে বলব সিনেমাও মানুষের স্বপ্ন পূরণ করে, আর যদি মনে হয় ওপরের শিল্পমাধ্যমগুলির স্বপ্ন পূরণ করা উদ্দেশ্য নয়, তারা সমাজসচেতনার কাজ করে, তারা শিক্ষার বিস্তার ঘটায়, তারা প্রতিদিনকার জীবনে যা ঘটে তা আমাদের সামনে তুলে ধরে— দেখো! এই কি তুমি চেয়েছিলে? এই কি তোমার চরিত্র? এই কি তোমার ভালবাসার পরিচয়?

ছ'শো বছর আগের এক চৈনিক কবির ভাষায় যে পদ দিয়ে তুমি চলে এসেছ তা কি চিরকালীন, যে নাম তুমি দিয়েছ সবার তাও কি চিরকালীন? বাড়ি থেকে খানিক দূরে যে ল্যাম্পপোস্ট তাতে আলো জ্বলে না। ঘরের চাবিটা সেখানেই বোধ করি হারিয়ে বসে আছে। আবছা আলোয় খুঁজে পাবে তাকে?

ভালবেসে তুমিই তো বলেছ, এরা হচ্ছে শিল্প আর সংস্কৃতি। তুমিই তো ওদের ঘরে রাশি রাশি দায়িত্ব চাপিয়ে বসে আছো। বুনো ওল খেয়ে বসে আছো, এবার সামলাও। তোমার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী, না কি প্রমোদ উপকরণের জোগানদার, না কি শিক্ষক? কোনটা?

সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি আগন্তুকের কথা মনে আছে তো? শেষ দৃশ্যে ছোট মামা চলে যাচ্ছেন, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। পকেট থেকে খাম একটা বার করে ভাগনির হাতে দিলেন। তাতে একটা চেক ছিল। অনেক টাকার চেক। ভাগনি ওটা খুলতে উদ্ধত হলে ছোটমামা বললেন, আমি যাই তারপর খুলে দেখো।

লেখকের মনে হচ্ছে, সিনেমা নামক শিল্পটিকে লুমিয়ের ব্রাদার্স আর হীরালাল সেনরা আমাদের হাতে খামে ভরে দিয়ে গেছেন। যাওয়ার আগে খুলতে মানা করেছিলেন। আমরা অতি আগ্রহে সেটা খুলে ফেলেছি, এবার তো আমাদেরই দায়িত্ব। এটাকে নিয়ে কোন পথে যাব। না জানি কোন নদীর বাঁকে গ্রামের ঠিকানা লেখা ছিল সেই খামে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ শিশু বিকাশ কেন্দ্র

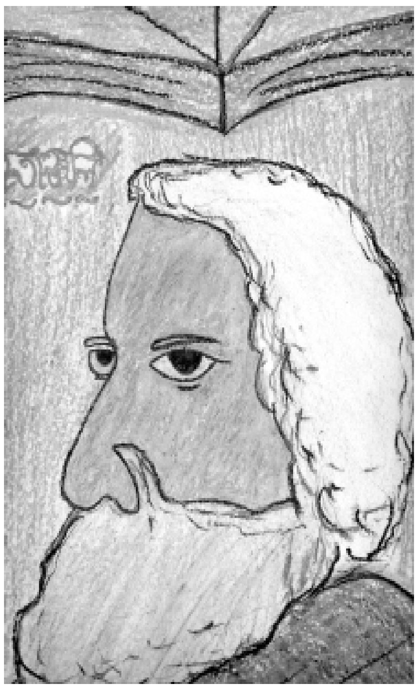

সুদীপ্তা কুণ্ডু
রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল

সেবক প্রতিনিধি: আমাদের শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। প্রায় ৩০ বছর আগে ১৯৮৬ সাল নাগাদ 'সঙ্ঘের' উদ্যোগী সদস্যরা শিশুদের বহুমুখী মেধার বিকাশের উদ্দেশ্যে 'শিশু বিকাশ কেন্দ্র' গড়ে তোলেন। যা আজও অব্যাহত। আবৃত্তি, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা এই ধরনের Hobby-কে উৎসাহ দেওয়া এবং শিশুদের মধ্যে শৈল্পিক চেতনার বিকাশই শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে আবৃত্তি ও সঙ্গীত শিক্ষার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে ছবি আঁকার ক্লাস অবশ্যই খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত আঁকা ক্লাস চলে। অনেক মাস্টারমশাইরা সময়ে সময়ে এসেছেন। বহু ছাত্রছাত্রী ছবি আঁকা শিখেছে ও প্রদর্শনীও করেছে। যারা এখানে শিখেছে তাদের মধ্যেই এখন অনেকেই আজ মাস্টারমশাইও হয়েছেন। বর্তমানে স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীচারু খান মহাশয় মাঝেমাঝে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আঁকা নিয়ে বসতে সম্মত হয়েছেন। বড়দের থেকে যতটুকু পাওয়া যায়— তাই তো লাভ। শিশুদের জানার আগ্রহ ও দেখার দৃষ্টি-ক্ষমতা বাড়ানোর আগ্রহ যাতে তৈরি হয় সেদিকে আজ আমরা বিশেষ নজর দিয়ে থাকি। আমরা আশা করব আরও অনেক শিশু আগামীতে এখানে আসবে। ভবিষ্যতে শিশু বিকাশ নিয়ে আমাদের আরও নানারকম চিন্তাভাবনা আছে। হংকং-এর সামদাসানি ফাউন্ডেশন শিশু বিকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে গত দু'বছর ধরে কিছু অর্থ সাহায্য করেছে।

সেবক

কলকাতা ২৮ ভাদ্র ১৪২১ ● রবিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

আত্মকথা

প্রকাশিত হল 'সেবক'। 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘে'র পত্রিকা। এখন আপাতত দ্বিমাসিক। আটষট্টি বছর আগে এতদ অঞ্চলের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের তাগিদের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবনে প্রকৃত মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতেই 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ' পথ চলা শুরু করে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ না হয়ে দীর্ঘ পথ চলার প্রক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন সেবামূলক ক্রিয়াকর্মে নিয়মিত নিয়োজিত থেকে এই সংস্থা আজ মহীরূহে পরিণত। যদিও এই দীর্ঘ যাত্রাপথ খুব সরলরেখায় চলেনি! অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নানান সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করতে হয়েছে, তেমনই বহু সচেতন মানুষের সক্রিয় সম্পৃক্তিই 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ'কে আমাদের অঞ্চলের একটি অনন্য সংস্থা হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। যা নিয়ে আমরা প্রকৃতই গর্বিত। 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘে'র নিয়মিত পরিষেবাগুলোর কিছু কিছু হয়ত আজও থেকে গেছে অঞ্চলের বিপুল মানুষের অজানা। তাই এই পত্রিকা। 'সেবক'। পরিষেবাগুলো সবিস্তারে অনেকের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই উদ্যোগ। যখন সমাজের বিভিন্ন সমস্যায়, বিশেষভাবে অঞ্চলবাসী, নানা ভাবে জর্জরিত ঠিক তখনই এই পত্রিকার প্রকাশ। যোগাযোগের আরও একটি মাধ্যম হিসেবে পত্রিকা 'সেবক' তার নামের প্রকৃত অর্থই বহন করবে। দাবি রাখলাম।

মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা — স্মরণীয় বরণীয়

ডাঃ কল্যাণ দত্ত চৌধুরি

মনের মণিকোঠায় যেসব স্মৃতি পুস্তকাকারে জমা হয়ে আছে, তার পাতা ওল্টালেই পুরনো পাতিপুকুরের অনেক দৃশ্য ভেসে আসে। তখন না ছিল ভি আই পি রোড, না সল্টলেক। লেক টাউন তখন নির্মীয়মাণ। লেক টাউন যেখানে ভি আই পি রোডে মিশেছে, তারই খালপাড়ে একটা ঘাট ছিল। খড়ভর্তি নৌকা আসত গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে। সুরকির রাস্তা ক্যানাল স্ট্রিট ওই ঘাটে গিয়ে মিশেছে। পোস্ট অফিস নেই, বাজার নেই। বাস ধরার জন্য যেতে হত যশোর রোডের তেঁতুলতলা বাসস্টপে। তখন এতদ্‌ঞ্চলে দু'টি বাড়ি ছিল। একটি বাড়ির মালিক গৌরাঙ্গচন্দ্র বণিক, অপরটির মালিক মাণিক্যরতন গুহঠাকুরতা। আমরা পাতিপুকুর অঞ্চলে ছিলাম। ১৯৫০ সাল থেকে। আদ্যনাথপল্লীর একটি ভাড়াবাড়িতে। তখন আদ্যনাথপল্লী তৈরি হচ্ছে। এখনকার ক্যানাল স্ট্রিট এবং দক্ষিণ পাতিপুকুর ছিল একটি গ্রামীণ পরিবেশ। শ্রীভূমির কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

অনাবাদী, অবহেলায় পড়ে থাকা পরিত্যক্ত জমি। এখানে-ওখানে সামান্য কিছু চাষবাস হয়। এলাকার উন্নয়নপ্রয়াসী, স্বপ্নালু ও কর্মোদ্যোগী মাণিক্যরতনের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠল 'পাতিপুকুর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'। তাঁর সহযোগী হলেন আদ্যনাথপল্লীর পীযূষচন্দ্র ঘোষ ও গৌরাঙ্গচন্দ্র বণিক। গড়ে উঠল শ্রীভূমির ভিত্তিভূমি। ১৯৫৭ সাল, আমরা এলাম শ্রীভূমিতে। তখন এখানে বেশ কয়েকটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেক বাড়ি তখনও তৈরি হচ্ছে। ৭০ দশকের একটি পরিচিত দৃশ্য, দু'জন মাঝবয়সী ভদ্রলোক পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'জনের কাঁধেই ভিক্ষার ঝুলি। একজন ভদ্রলোক সৌম্যদর্শন, ফর্সা, অনিন্দ্যকান্তি, ব্যক্তিত্বময় মুখাবয়ব। ইনি মানিকবাবু, তাঁর সঙ্গী অপরজন জ্ঞান দত্ত। ক্যালকাটা উইমেন্স কলেজের উপাধ্যক্ষ। সবাই দেখত দু'জন সর্বদা একই সঙ্গে থাকেন। লোকেরা বলত 'মানিকজোড়'। নবাগত কেউ হয়ত এই জুটিকে দেখে অপরজনকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বলুন তো এঁরা কারা? এঁদের পরিচয় কী?' জবাব ছিল 'মানিকজোড়'। চিন্তা নেই, আপনারা তো নতুন এসেছেন, ওঁরা যাবেন আপনার বাড়িতে আপনাদের স্বাগত জানাতে। পরে দেখা গেল, মানিকজোড় তাঁর বাড়িতে হাজির। উদ্দেশ্য একটাই, গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য চাঁদা সংগ্রহ এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। মানিকবাবুর দৃঢ়প্রত্যয় ছিল, বিন্দু বিন্দু জমা হয়ে সিন্ধুতে পরিণত হয়। তিনি সর্বদাই আশাবাদী এবং উদ্যোগী ছিলেন।

আমার ছিল বদলির চাকরি, মাঝে মাঝে বাড়ি আসতাম। ছুটির দিন, বৌদিও বাড়ি আছেন। দেখলাম বৌদি বেশ ব্যস্ত। কী ব্যাপার? শুনলাম আমাদের বৈঠকখানা ঘরে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মিটিং হবে। বৌদি চায়ের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। কোনও একজন রসিকতা করে বললেন, 'পলিটব্যুরোর বৈঠক'। গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আজকের সভায়। বিষয় কী? এলাকা উন্নয়ন। কী করতে হবে? বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পোস্ট অফিস স্থাপন, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি। মানিকবাবুর লোক চেনার অসামান্য প্রতিভা ছিল। মিটিং শেষে এক-একজনকে বিশেষ ভার দিলেন। তাঁরা ভারপ্রাপ্ত হয়ে লেখালিখি শুরু করে দিলেন। কোথাও কেউ নিরুদ্যম হলে মানিকবাবু তাঁকে উদ্দীপ্ত প্রেরণা দান করতেন। কালক্রমে প্রতিষ্ঠা হল পোস্ট অফিস। ক্যানাল স্ট্রিটের সংস্কার হল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক শাখা খুলল। অবশ্য এর আগে একটি কমিটি গঠন করা হল। যাঁরা মানিকবাবুর উদ্যোগে যে বসতি তৈরি হয়েছিল তাঁরা তার নামকরণ স্থির করবেন। 'শ্রীভূমি' নামের প্রস্তাবক ছিলেন মানিকবাবুর নিত্য সহচর জ্ঞান দত্ত। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে বলা হল খুব বেশি চিঠিপত্র লিখতে, যাতে পোস্টাল অথরিটি এই পোস্ট অফিসকে স্থায়ী পোস্ট অফিসের মর্যাদা দেয়।

মানিকবাবুর স্বপ্ন ছিল 'গান্ধী সেবা সঙ্ঘ'কে একটি বহুমুখী জনকল্যাণকর সংস্থায় উন্নীত করা। বর্তমান কর্মকাণ্ডের পরিধি দেখলে মনে হয়, সত্যিই তার স্বপ্নপূরণ হয়েছে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আজ বিতর্কের সম্মুক্ষীণ!

শঙ্কর লাল ঘোষাল

(অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, উপদেষ্টা, ইউ বি আই)

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহই ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ইতিহাস খুঁজতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে ১৯৫৫ সালে, যখন সরকারি কাজে লেনদেনের সুবিধার্থে ভারত সরকার Imperial Bank of India-কে জাতীয়করণ করে State Bank of India প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর ১৯৬০ সালে স্টেট ব্যাঙ্কের সহযোগী আরও ৭টি ব্যাঙ্ককেও একইভাবে জাতীয়করণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ১৯৮০ সালে আরও ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঋণদানের নীতি-নির্ধারণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে।

অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেন যে, জাতীয়করণের পর ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অগ্রগতি বিশ্বের যে কোনও জায়গার তুলনায় নজিরবিহীন

ফলস্বরূপ গড়পড়তা সাধারণ মানুষ, বিশেষত গ্রামের মানুষ ও গরিব আমানতকারীদের কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিষেবা গ্রহণ সহজসাধ্য হয়ে উঠল। ব্যাঙ্কগুলি এতদ আমানতকারীদের আর্থিক প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা দেওয়া শুরু করল। রাষ্ট্রীয়করণের সুফল হিসেবে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাঙ্কের পরিষেবাও উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করল।

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৬৯ সালে ব্যঙ্ক জাতীয়করণের পরে ২৮ বছরে এই সমস্ত সরকার অধিগৃহীত ব্যাঙ্কের (PSB) শাখা বৃদ্ধি পেয়ে ৭,২১৯ থেকে প্রায় ৫৭,০০০-এ পৌঁছে গেল। যা কিনা শতাংশের হিসেবে প্রায় ৮০০ শতাংশ। একইভাবে আমানত ও ঋণের পরিমাণেও ব্যাপক বৃদ্ধি হল, যথাক্রমে ১১০০০ শতাংশ ও ৯০০০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়াল ৫০৩৫.৯৬ বিলিয়ন এবং ২৭৬৫.৩ বিলিয়ন টাকা। শুধু তাই নয়, প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা গেল কর্মচারীভিত্তিক উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও, যা এই ব্যাঙ্কগুলিতে ক্রমবর্ধমান।

অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেন যে, জাতীয়করণের পর ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অগ্রগতি বিশ্বের যে কোনও জায়গার তুলনায় নজিরবিহীন। বিশেষত যেভাবে সারা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটেছে। বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কের জন্য ভারতের বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিই ভারতীয় অর্থনীতিকে পরিচালিত করে চলেছে এবং সার্বিক জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই তাদের আমানত বা ঋণ, সব ক্ষেত্রেই এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পরিষেবা গ্রহণ করে থাকে। এখানেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০০৮ সালে ভারত সরকার ৬০,০০০ কোটি টাকা কৃষি-ঋণ মুকুব করা সত্ত্বেও কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কই ঘাটতির সম্মুখীন হয়নি।

উপরোক্ত তথ্য থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উদার অর্থনীতিব .বেড়াজালে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বি-রাষ্ট্রীয়করণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হয়ে যাবে। কারণ দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ জনগণকে অতি সহজ-সরল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে এই সুবিশাল সাম্রাজের ওপর মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলে ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের আসলে ক্ষতিই হবে।

Nayak Panel-এর সুপারিশ এই চিত্রনাট্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। Axis Bank-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মি. নায়াকের নেতৃত্বে RBI (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া) কর্তৃক গঠিত এই Panel ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবহার আমূল সংস্কারের সুপারিশ করেছে, যাতে প্রকারান্তরে প্রস্তাব করা হয়েছে সরকার অধিগৃহীত সমস্ত ব্যাঙ্ককে Bank Investment Company-র মতো কোনও একটি সংস্থার অধীনে নিয়ে আসার জন্য। এরা আরও সুপারিশ করেছে, এই ব্যাঙ্কগুলিতে সরকারের অংশীদারিত্ব ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার, যাতে ব্যাঙ্কগুলিতে নজরদারিতে কর্মচারী ক্ষতিপূরণ এবং তথ্য জানার অধিকার-এর মতো বিষয়গুলি বলবৎ করার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত হয়।

এই সুপারিশগুলি নিয়ে সুদীর্ঘ সময় ধরে বিতর্ক চলবে, কারণ বর্তমানে ভারত এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে, যখন একদিকে দীর্ঘদিন ধরে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েই চলেছে, অপরদিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্রমশ নিম্নগামী আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুক্ত হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা এবং সর্বোপরি Balance of Payment-এর সঙ্কট। সব কিছু মিলিয়ে আসুন আমরা ভবিষ্যতে এই বিতর্কের জন্য অপেক্ষা করি।

সেবক পত্রিকার কার্যকরী সমিতি

সম্পাদক: **জবা গুহঠাকুরতা**

সেবক লোগো: **দেবব্রত ঘোষ**

সম্পাদকমণ্ডলী: **বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, উৎপল ঘোষ, শঙ্কর লাল ঘোষাল পৃথ্বীপতি চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় আঢ্য, নীতিশ মুখার্জি**

উপদেষ্টামণ্ডলী: **ডঃ হিরন্ময় সাহা, গৌতম সাহা**

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পরিষেবা

সেবক প্রতিবেদন: গত আট বছর ধরে যে সমস্ত পরিষেবা নিয়মিত পরিবেশন করে আসছে, তার বিবরণ সবার জ্ঞাতার্থে দেওয়া হল।

১। **যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** প্রতিদিন সকাল ৫.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত। মাসিক ৫০ টাকা মাত্র

২। **অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র:** প্রতি সোম থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। ১০ টাকা দিয়ে কার্ড করতে হয়। মাসে গড়ে ৩০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন।

৩। **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র:** সোম, বুধ ও শুক্রবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। চিকিৎসা ও ওষুধ বাবদ ৫ টাকা দিয়ে কার্ড করতে হয়। এই বিভাগে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা মাসে গড়ে ৬০০।

৪। **চক্ষু বিভাগ:** প্রতি সোমবার সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চক্ষু পরীক্ষা হয়। ৫ টাকা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। চক্ষু পরীক্ষা, ওষুধ, চশমা, প্রয়োজনে ছানি অপারেশনও হয় বিনা খরচে। বিভাগটি পরিচালনার ক্ষেত্রে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লেক টাউনের পূর্ব কলকাতা নাগরিক পরিষদ ট্রাস্ট নামে এক সংস্থা।
প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত শুধুমাত্র চক্ষু পরীক্ষা হয়। ৫ টাকা দিয়ে কার্ড করা হয়।

৫। **ই সি জি:** প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধে ৬টা থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত অভিজ্ঞ technician দ্বারা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মন্তব্য-সহ ই সি জি মাত্র ৪০ টাকার বিনিময়ে।
উল্লেখ্য, ফ্রান্সের সমাজসেবী সংস্থা ‘প্ল্যানেট ক্যায়ার’ বিগত কয়েক বছর ধরে সঙ্ঘের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিচ্ছে।

৬। **মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র (সরকারি টিকাকরণ কেন্দ্র):** প্রতি বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা শিশুদের টিকাকরণ ও গর্ভবতী মায়েদের শরীর-স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। শিশুদের জন্ম থেকেই যে সব টিকা দেওয়া হয়, এখানে তার ভাল ব্যবস্থা আছে।

৭। **শিশুবিকাশ কেন্দ্র:** প্রতি রবিবার ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শিশুদের আঁকা ও হাতের কাজ শেখার ক্লাস হয়। মাসিক মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে।

৮। **গ্রন্থাগার:** গান্ধী সেবা সঙ্ঘ লাইব্রেরি সপ্তাহের প্রতিদিনই বিকেল ৫.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। এছাড়া ১২-১৩টি জনপ্রিয় পত্রিকাও এখানে রাখা হয়। বই অবশ্যই বাড়ি নিতে পারা যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা ৯ হাজারেও বেশি। বর্তমানে শিশু থেকে বৃদ্ধ, নানা বয়সের ২০০-র বেশি সদস্য নিয়মিত লাইব্রেরিতে বই দেওয়া-নেওয়া করেন।

৯। **সাংস্কৃতিক বিভাগ:** নিয়মিত নাটক, গান, বাজনা, সাহিত্য আলোচনার আয়োজন করা হয়। আমাদের চারপাশে যেসব গুণী মানুষজন আছেন তাঁদের আমরা সর্বদা আহ্বান জানাই এখানে এসে নিজেকে প্রকাশ করার।

১০। **মাণিক্য মঞ্চ:** গান্ধী সেবা সঙ্ঘের নিজস্ব একটি সুন্দর মঞ্চ আছে। অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রসারে প্রয়োজনে স্বল্পমূল্যে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। মাণিক্য মঞ্চ ব্যবহারের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

১১। **গান্ধী সেবা সঙ্ঘ পরিচালিত সেবানিবাস:** বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, বিহার ইত্যাদি দূর প্রান্ত থেকে যেসব ক্যান্সার-আক্রান্ত রোগী আসেন কলকাতা শহরের চিকিৎসার জন্য, তাঁদের সুলভে থাকার ব্যবস্থা করা হয় এই সেবানিবাসে। এখানে রান্নাঘর আছে। বাসনপত্র, বিছানা, চাদর, গ্যাসের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। রোগীরা নিজেরাই রান্না করেন। এবং একটি ঘরোয়া পরিবেশে থাকেন।

রোগী ও সঙ্গীর সেবানিবাসের পরিকাঠামো ব্যবহারের জন্য অনুদান—

দোতলায়:

১) দুই শয্যার ঘর (সংলগ্ন বাথরুম) ১ থেকে ৭ দিন থাকার জন্য প্রতিদিন ১২০ টাকা হিসেবে
৭ দিনের বেশি থাকার প্রয়োজনে প্রতিদিন ১০০ টাকা হিসেবে (পুরো সময়ের জন্য)

২) বহু শয্যার ঘর (ডর্মেটরি) (প্রতি জনের জন্য)
সাধারণ রোগী ও সঙ্গীদের জন্য ৩৫ টাকা জন-প্রতি, প্রতিদিন
বি পি এল বা বিশেষ সুপারিশ-সহ রোগীদের জন্য ২৫ টাকা জন-প্রতি, প্রতিদিন

তিনতলায়:

দুই শয্যার ঘর (কমন বাথরুম)
১ থেকে ৭ দিন থাকার জন্য প্রতিদিন ১০০ টাকা হিসেবে
৭ দিনের বেশি থাকার প্রয়োজনে প্রতিদিন ৮০ টাকা হিসেবে (পুরো সময়ের জন্য)

থাকার জন্য আবেদনপত্র ও টাকা জমা দেওয়ার নিয়মাবলি—

আবেদনপত্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ করুন

১) সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্রের প্রতিলিপি জমা দিন।

২) সঙ্গী ছাড়া কোনও রোগীকে থাকতে দেওয়া হয় না।

৩) সেবানিবাসে সংক্রামক রোগীদের থাকার ব্যবস্থা নেই।

৪) ফর্ম জমা দেওয়ার সঙ্গে এক সপ্তাহের টাকা জমা দেওয়া আবশ্যিক।

৫) প্রতি সপ্তাহের শুরুতে অগ্রিম টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬) যে কোনও টাকা দেওয়ার সময় অবশ্যই পাকা রসিদ সংগ্রহ করবেন।

ফর্ম সেবা-কর্মীর কাছে বা অফিসে পাওয়া যাবে।

যে কোনও ধরনের অসুবিধার কথা সেবানিবাসের সেবা-কর্মীদের জানান ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ—

Address : Gandhi More, 207/1, S. K. Deb Road, Shreebhumi, Lake Town, Kolkata-700 048
Office Ph : 2521 4011

Mobile

Goutam Saha	:	9432000260
Apurba Kundu	:	9735101092
Deepa Dutta	:	9007833036
Samir Nandi	:	9830414527
Anirudha Ghosh	:	9830175498

চিকিৎসা সঙ্কট

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলো যদি খুব সংক্ষেপে সাজিয়ে দেখা যায়, তাহলে দৃশ্যটা এরকম হবে:

১। বড় শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকায় যথেষ্ট ডাক্তারের অভাব। ২। অসুখ নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর স্বল্পতা। ৩। স্বাস্থ্য অসচেতনতা। ৪। সর্বব্যাপী দূষণ।

এবারে দেখা যাক, নেতা ও নীতি নির্ধারকেরা ভোটের প্রতিশ্রুতি, কায়দার রিপোর্টে ইত্যাদিতে এই সমস্ত সমস্যাকে কীভাবে মোকাবিলা করার পথ দেখাচ্ছেন। সমস্ত বক্তব্যের নির্যাস একত্র করলে তা হবে এরকম:

(১) হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার বাড়ানো হোক/হবে।

(২) যত বেশি সম্ভব সুপার স্পেশালিটি/স্পেশালিটি/সাধারণ হাসপাতাল বাড়ানো হবে/হোক

(৩) ডাক্তারিতে আসন বাড়ানো হবে/হোক।

গত ৬০ বছর ধরে করদাতারা এসব ছেলেভোলানো কথা শুনে আসছেন শাসক/বিশেষজ্ঞ নির্বিশেষে।

কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে দেখছি, হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত ৪৭-এও যে তিমিরে ছিল, ২০১৪-তেও সেই তিমিরেই ডুবে আছেন। আগে তাও ধনীদের জন্য খানিক ভাল চিকিৎসার আশ্বাস ছিল, এখন সে জায়গায় অজস্র সুযোগসন্ধানী দালাল কথায় কথায় লাখ টাকার ওষুধ গিলিয়ে, কিডনি কাটতে গিয়ে লিভার বাদ দিয়ে তাঁদের মানিব্যাগ খালি করে বাড়ি বা শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারপাশে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাটা একান্তই বাস্তব, কিন্তু তার সমাধানের জন্য যে দাওয়াই বাতলে চলেছেন আমাদের কর্তারা, এ সমস্যার মোকাবিলা করা সে দাওয়াইয়ের সাধ্যের বাইরে। প্রশ্ন উঠবে কেন?

আসুন পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাপারটা ভাবা যাক।

১। ডাক্তার ও হাসপাতালের সংখ্যা:

যদি ধরে নিই গড়ে ১৭০ জন মানুষের জন্য একজন ডাক্তার রাখলে তিনি সকলের স্বাস্থ্যের ঠিকমতো যত্নবিধান করতে পারবেন, তাহলে এদেশে ডাক্তারের দরকার হবে (ভারতের জনসংখ্যা ১২৫ কোটি ধরে নিয়ে) ৭৫ লক্ষ। নভেম্বর ২০১১-তে বের হওয়া সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার আছে ৬ লাখ, তার মানে এদেশে মোটামুটিভাবে প্রতি দু'হাজার মানুষে একজন ডাক্তার। অনুপাতটা ঠিক জায়গায় আনতে হলে আরও ৬৯ লক্ষ ডাক্তারের প্রয়োজন।

ওই একই বছরে দেখা গেছে, ভারতে হাসপাতালের সংখ্যা ১২,৭৬০, তাতে বেডের সংখ্যা ৬ লাখের একটু কম। অর্থাৎ ১২৫ কোটি লোকের জন্য হাসপাতালের বেড আছে ৬ লাখ। বেড-পিছু মানুষের সংখ্যা হল ২,০৯০-এর মতো। আবার যদি জনস্বাস্থ্য রক্ষার জাতীয় প্রচেষ্টায় সবচেয়ে এগিয়ে থাকা কিউবার হিসাবটা ধরে নিই, তাহলে দেখব সেখানে এই অনুপাতটা বেড-প্রতি ১৮৯ জন।

এই হিসাবে পৌঁছতে হলে এদেশে হাসপাতালের বেড হতে হবে ৬৬ লক্ষ ৩৪ হাজার। মানে বর্তমানের থেকে বাড়তে হবে ৬০ লক্ষ ৩৪ হাজার।

আরও বহু পরিসংখ্যান দেওয়া যায়, কিন্তু তা দিয়ে লেখাকে ভারাক্রান্ত না করেও একটা কথা বলে দেওয়া যায়— ওপরের (ক) ও (খ) থেকে যা দেখা যাচ্ছে তাতে বাস্তব ও আদর্শ অবস্থায় এতটা ফারাক নিকট ভবিষ্যতে কোনওভাবেই মেটানো সম্ভব নয় যে পণ্ডিত যে তত্ত্বই খাড়া করুন না, যা যতই গালভরা ফিল গুড খবর বাজারে দেওয়া যাক না কেন, এ ফারাক মেটানো সম্ভব নয়।

আমাদের এই বাস্তবটাকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে ও সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে।

সমাধানের রাস্তা

আছে। অন্তত পুরোটা না হলেও বেশ খানিকটা দূর এগোনোর মতো উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। তবে সেটা বুঝতে গেলে আগে বুঝতে হবে এদেশে অসুস্থতার ছবিটা ঠিক কীরকম।

ভারতবাসীর অসুস্থতার একটা সাধারণ চিত্র নিলে দেখা যাবে, এদেশে রোগভোগে মৃত্যুর শতকরা ৩৮ ভাগ হয় পেট, শ্বাসনালি ও ফুসফুসের (ইত্যাদি) সংক্রমণজনিত অসুখে। ইউনাইটেড নেশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, এদেশে জলবাহিত রোগে বছরে মারা যায় ১ লাখের বেশি মানুষ। ফ্লোরাইড দূষিত জল খেয়ে রোগে ভুগছেন এদেশের সাড়ে ৬ কোটির বেশি লোক। এদেশের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ গ্রামে পানীয় জল পানের উপযুক্ত নয়। ইউ এন এ-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ১২২টা দেশকে নিয়ে করা সমীক্ষায় নাগরিকদের ভাল জল সরবরাহ করার মানের তালিকায় আমাদের স্থান ১২০ নম্বরে।

সমাধান: যত ডাক্তার বা যত হাসপাতাল লাগবে আদর্শ অবস্থায় পৌঁছতে, সেটা যখন সংখ্যাগতভাবেই অসম্ভব, তখন মনোযোগটা ডাক্তারির দিকে বেশি না দিয়ে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে (তার খানিকটা ঘুষ, খানিকটা দালাল ইত্যাদি খাবে) গ্রামে গ্রামে ডাক্তারহীন অকেজো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা না বাড়িয়ে প্রত্যেকটা গ্রামে একটা নলকূপ, বাড়িতে বাড়িতে না হলেও গ্রাম-প্রতি এক জায়গায় গোটা দশেক করে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হলে রোগীর সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে যাবে। কথায় বলে, মেডিসিন শুড বি দ্য লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। অর্থাৎ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওষুধ হবে প্রতিরোধের শেষ পদ্ধতি। এদেশের সমস্যাটা মূলে রয়েছে এর বিপরীত তত্ত্বের আদর্শ। অসুখ হলে ওষুধ খাও। কিন্তু অসুখটা যাতে আদৌ না ঘটে তার বন্দোবস্তটা নিলেই কিন্তু অনেক সমস্যারই সমাধান হয়।

এইখানে আমাদের নগরবাসী অ্যাটাচড বাথ ব্যবহারকারী তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী ভুরু নাচিয়ে বলবেন, ওসব বানিয়েও লাভটা কী? ব্যাটাদের কোনও সেন্সই তো নেই। যতই চেষ্টা করুন, সেই পুকুরের জল খাবে আর টয়লেট দুদিনে ভেঙেচুরে ফের মাঠেই রওনা দেবে। ঠিক। সত্যিকথা। আর সেই জন্যই এ পদক্ষেপগুলোর পাশাপাশি ডাক্তার বানাবার চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার স্বল্প প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির দিকে। কলকাতা দিল্লির কলেজে নয় একেবারেই। শহরবাসী মানুষ এ সব বিদ্যে শিখে কস্মিনকালেও যে গ্রামের দিকে পা দেবেন না সে তো পরীক্ষিত সত্য। তার বদলে এই স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির কাজটা পুরোদমে পঞ্চায়েত স্তরে করলে স্থানীয় মানুষই সে কাজে ঢুকবেন। শহরে বসে সারা মাস অনুপস্থিত থেকে মাইনের দিনে গ্রামে যাওয়া স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তার তৈরি হবে না।

দ্বিতীয় আর একটা পদ্ধতির কথাও এখানে প্রয়োজনীয়। পুরোদস্তুর একজন ডাক্তার তৈরির যে হাতি পোষার খরচ সে পয়সায় এক বা দু'বছরের ক্র্যাশ কোর্সে দশ পনেরোজন প্যারামেডিক তৈরি করা যায়। ডাক্তার তৈরির বাজেটটার অর্ধেক যদি এই কাজে লাগানো হয় তাহল কিন্তু যতগুলো ডাক্তার তৈরি হবে তার দশ পনেরো গুণ প্যারামেডিক তৈরি হবে তার পাশাপাশি। এঁরা ঠিকভাবে ছড়িয়ে গিয়ে কাজ করলে বহুক্ষেত্রেই রোগীর প্রাণ বাঁচবে ও তাঁকে কোনও চিকিৎসালয় অবধি আসতেও হবে না। মার্কিন প্যারামেডিক পদ্ধতির দিকে একনজর দেখলেই ব্যাপারটার সার্থকতা বুঝতে পারা যায়। সে দেশে কিন্তু কিউবার তুলনায় ডাক্তার প্রতি রোগীর সংখ্যা প্রায় সোয়া দু'গুণ বেশি (প্রতি ৩৯০ জনে একজন ডাক্তার)। তবু সেখানে ডাক্তারের কাছে চাপটা যে এ দেশের মতো উদ্ভটরকম বেশি নয় এবং সে দেশের লোক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেক বেশি ভাল আছেন তার একটা কারণ কিন্তু এই প্রশিক্ষিত প্যারামেডিকের দল। (এবং অবশ্যই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কারণটা হল পরিষ্কার পানীয় জলের নিশ্চিত সরবরাহ, ডলার নয়)।

আরও একটা পথ রয়েছে। আমাদের গ্রামাঞ্চলগুলোতে সরকারি দাক্ষিণ্যের দৈন্যদশার দরুণ প্রায় সর্বত্রই দিশি হাতুড়ের রমরমা। তেলপড়া জলপড়া গাছপালার রস, চালাক হলে তার মধ্যেই খানি অ্যালোপ্যাথি ওষুধ মিশিয়ে মডার্ন জলপড়া তৈরি এইসব পদ্ধতিতে তাঁরা স্বগ্রাম ও ভিনগ্রামের স্বাস্থ্যের ঠিকা নিয়ে চলেন। বদনামী এই লোকগুলো কিন্তু নিইড় স্বাস্থ্যরক্ষার মডেলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন। ভাবুন তো, এঁদের ধরে যদি খানিক বেসিক স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন, কিছু প্রাথমিক ওষুধ, ও আর এস আনাবার কায়দা, শিশুজন্মের পর প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা করে প্রোৎসাহন ভাতার বন্দোবস্ত করে দেওয়া যায় তাহলে এঁরা স্থানীয় এলাকার জ্ঞান ও প্রসারের ওপর এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় মানুষের অখণ্ড বিশ্বাসের শক্তিতে ভর করে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতে কত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন? মনে পড়ে অশনি সঙ্কেতের সেই পণ্ডিতের বিধান? গ্রামে মহামারী রোধে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির বইয়ের পাঠ থেকে নির্দেশ তুলে এনে তাকে অলৌকিক বিধানের সঙ্গে কীভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন স্বল্পশিক্ষিত মানুষটি। যতদিন না এ দেশে সবাই শিক্ষিত হয়ে ওঠে ততদিন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা এই ধরনের মানুষদের এইভাবে কাজে লাগাবার একটা পথের ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন কোনও কর্পোরেট কর্তা বা রাজনৈতিক দাদা নন। একজন সামান্য সাহিত্যিক।

তবে অন্তিমে সেই একই প্রশ্ন— করে কে? এ কাজে তো সভায় দাঁড়িয়ে এইমস অ্যানাউন্স করার মতো টি আর পি ভ্যালু থাকবে না। নীরবে নিঃশব্দে গ্ল্যামারবিহীন কাজ। আর আমার দেশবাসীর চরিত্র নিয়ে সেই মহদ্যুতিটি তো রয়েছেই, 'লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে?'

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল আসলে কাদের স্বার্থে?

নীতিশ মুখার্জি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুসারে কোনও জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশের বিএমআই (Basic Metabolic Index) যদি ১৮.৫-এর কম হয় তবে সেই জনগোষ্ঠীকে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলে ঘোষণা করা উচিত। এই মান অনুসারে ভারতের বহু অঞ্চলের মানুষই ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকেই চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষ কবলিত বলে উল্লেখ করা যায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র তত্ত্বাবধানে বিশ্বায়নের সূত্রপাত ১৯৯১ সালে। বিশ্বায়ন-উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষের উন্নতি ঘটানো। অনাহার ঘুচবে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা উৎসা পট্টনায়েক তাঁর ক্ষুধার প্রজাতন্ত্র (The Republic of Hunger) গ্রন্থে দেখিয়েছেন বিশ্বায়নের এই সময়ে পরিবার পিছু খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হার কিভাবে কমেছে। ১৯৯১-এ পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার বছরে যেখানে ৮৮০ কেজি-র মত খাদ্যশস্য ব্যবহার করতেন, তা কমে ৭৭০ কেজি-তে দাঁড়িয়েছে ২০০৫ সালে। বলাই বাহুল্য, ২০১৪-তে তা আরও কমেছে। খাদ্যাভাব আরও প্রকট হয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের।

> বহুজাতিকদের সার-বীজ-কীটনাশক নয়, দরকার কৃষকদের নিজস্ব সার-বীজ ইত্যাদি সরকার কর্তৃক সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও শক্তিশালী গণবণ্টন ব্যবস্থা

খাদ্য সুরক্ষা ব্যাপারটা আসলে কি?

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার কথা বলতে গেলেই চলে আসবে খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামাঞ্চলের নিরাপত্তা, কৃষি ও কৃষিজীবীদের নিরাপত্তা। কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন হস্তক্ষেপ শুরু হয় প্রথম এতাওয়াতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পৃথিবীতে (বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে) কৃষির প্রাথমিক উপকরণ ও সার-প্রযুক্তির এক শক্তিশালী বাজার তৈরি করা। ষাটের দশকে ভারতে চাপিয়ে দেওয়া হল পিএল-৪৮০ চুক্তির শর্ত হিসেবে সবুজ বিপ্লবের ঘোষিত কর্মসূচি।

কেন্দ্রের পরিকল্পনা কমিশন বলছে ভারতের গ্রামাঞ্চলের মানুষের দৈনিক ২৪০০ ক্যালরিযুক্ত খাবার প্রয়োজন আর শহুরে মানুষের দরকার ২১০০ ক্যালরি। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ মাথাপিছু দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যের সুপারিশ করেছিল: মাঝামাঝি ধরনের কাজ করেন এমন পুরুষের জন্য ৫৭০ গ্রাম খাদ্যশস্য ও ৪৮ গ্রাম ডাল, ভারি কাজ করেন এমন পুরুষের জন্য ৭৩০ গ্রাম খাদ্যশস্য ও ৪৭ গ্রাম ডাল, মাঝামাঝি কাজ করেন এমন নারীর জন্য ৪৮৫ গ্রাম খাদ্যশস্য ও ৪৭ গ্রাম ডাল ভারি কাজ করেন এমন নারীর জন্য ৭২৮ গ্রাম খাদ্যশস্য ও ৪৭ গ্রাম ডাল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালে মাথাপিছু নীট খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল মাত্র ৪১৩ গ্রাম। এ থেকে সমগ্র ভারতের ছবিটা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বে সবচেয়ে বড় ব্যবসা আজ খাদ্যের

যে বা যারা খাদ্যের ব্যবসাটি কব্জা করতে পারবে তার বা তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে সমগ্র বিশ্ব। প্রথম সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি (MNC) ভারতের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল সংকর বীজ, কৃত্রিম সার, কীটনাশক ও আগাছা নাশকের ব্যবসার। সংকর বীজ-এর জন্য লাগে রাসায়নিক সার, কীটনাশক আর প্রচুর জল। উচ্চ ফলনশীল বীজের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াবার জন্য প্রতি বছর জমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। চাষের জন্য অতিরিক্ত জল মাটির নিচ থেকে তুলে ব্যবহার করার ফলে জলের সাথে আর্সেনিক উঠতে থাকে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক জল, জমি ও খাদ্যকে দূষিত করতে থাকে। পাঞ্জাব এর প্রকৃত উদাহরণ। সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একদা ডিরেক্টর ডঃ আর এইচ রিচারিয়া দেখিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে উন্নত বীজ নির্বাচন করে পরিবেশের কোনও ক্ষতি না করে, প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব ছিল।

আজ থেকে ৫০-৬০ বছর আগেও ভারতে কয়েক হাজার প্রজাতির বীজ পাওয়া যেত। যা প্রকৃতই ভারতীয় কৃষক সমাজের দান। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির তৈরি করা উচ্চফলনশীল বীজের ধাক্কায় তা এসে দাঁড়িয়েছে ১২-১৩টি-তে।

২০০৫ সালে ভারতীয় সংসদে পাস হওয়া নয়া পেটেন্ট আর প্রস্তাবিত বীজ আইনকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছরই মনস্যান্টো (এর ভারতীয় এজেন্ট মাহিকো), সিনজেন্টা, দ্যুপঁ ও কার্গিল বিপুলভাবে বীজ কিনতে বাধ্য করছে কৃষকদের। মনস্যান্টো, কার্গিল, ফাইজার, রয়েল ডাচ, শেল, দ্যুপঁ ইত্যাদির প্রধান লক্ষ্য দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নামে বীজের একচেটিয়া দখল। বীজের ওপর কৃষকের আর ছিটেফোঁটা অধিকারও থাকবে না ২০০৫ সালের ভারত-মার্কিন কৃষিজ্ঞান উদ্যোগ (AKI) নামক এই চুক্তির মাধ্যমে। ২০০৫-এর ১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এই চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তি-চাষ — আসলে কোম্পানি নির্ধারিত চাষ। ফলন ভালো হলে কোম্পানির মুনাফা আর কৃষকের মজুরি, কিন্তু ফলন মার খেলে সব দায় কৃষকের। ম্যাকিন্সের ফর্মুলা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়ে ভারতের বহু প্রান্তেই আজ এই চুক্তি-চাষ।

কর্পোরেট সংস্থাগুলির স্বপ্নের আইন হল BRAI (Biotechnology Regulatory Authority of Indian Act, 2009 বা ভারতীয় জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন)। প্রসঙ্গত, BRAI এখনও আইনে পরিণত হয়নি, বিল আকারে রয়েছে।

AKI চুক্তি কার্যকর করার জন্য ২০০৯ সালে প্রয়োজন হল BRAI প্রতিষ্ঠার। যেটি জিন পরিবর্তিত বীজের বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য ছাড়পত্র দেবার পদ্ধতিটি সরল ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির পছন্দমত করে দেবে। বিশ্বায়ন-উন্নয়নের সাল ১৯৯১ থেকেই বাজার অর্থনীতি চালু করা এবং দফায় দফায় দাম বাড়িয়ে রেশন ব্যবস্থাটাকে দুর্বল করার কাজ শুরু হয়। শুরু হয় 'টার্গেট রেশন' ব্যবস্থা (বিপিএল, এপিএল, অন্ত্যোদয়, অন্নপূর্ণা যোজনা ইত্যাদি নানা ভাগাভাগি)। 'টার্গেট রেশন' ব্যবস্থা মানেই গণবণ্টন ব্যবস্থার অবলুপ্তি।

বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন তাঁর 'গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকনটেন্ট' গ্রন্থে লিখেছেন-- 'পশ্চিমী ধনী দেশগুলো থেকে আমাদের বলা হয়েছিল এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের এনে দেবে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, কিন্তু দেখা গেল তা এনে দিল অভূতপূর্ব দারিদ্র..... এই ব্যবস্থা না পারলো দূর করতে দারিদ্রতা, না পারলো দিতে স্থিতিশীলতা'। পৃথিবীতে এখনই প্রতি রাতে ১২০ কোটি (১.২ বিলিয়ন) মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমোতে যায়। এটাই হল খাদ্য-নিরাপত্তার সার কথা। আর আজ ২০১৪-তে এসে চাল-গম ইত্যাদি দেওয়া হবে দেশের ৬৭% মানুষকে। অর্থাৎ সরকার নিজেই মেনে নিচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ খেতে পায় না, অভুক্ত থাকে। বহুজাতিকদের সার-বীজ-কীটনাশক নয়, দরকার কৃষকদের নিজস্ব সার-বীজ ইত্যাদি সরকার কর্তৃক সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও শক্তিশালী গণবণ্টন ব্যবস্থা।

২০০৯-১০ সালে বিটি-বেগুনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ আদায় করতে সফল হয়েছিলেন ভারতের নাগরিক সমাজ।

১৯৯২-৯৩-এ কৃষকরা কার্গিলের অফিস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ কৃষকের কাছ থেকে ২ টাকা কিলো দরে বীজধান কিনে সেই বীজধানই মোড়কে ভরে ১৮০ টাকা কিলো দরে কৃষককে কিনতে বাধ্য করছিল কার্গিল। ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকসমাজ এবং দেশের বিপুল কৃষক নতুন ইতিহাস নিশ্চয়ই লিখবে।

সিয়োংস তাইকোন্ডো অ্যাকাদেমি

সেবক প্রতিবেদন: গান্ধী সেবা সঙ্ঘের হলে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার সন্ধ্যা ৬.০০টা থেকে নিয়মিত তাইকোন্ডোর প্রশিক্ষণ চলে। এই অ্যাকাদেমির কর্ণধার মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর দিব্যেন্দু সিংহ একজন ফোর্থ ডান ব্ল্যাক বেল্ট স্বীকৃত হন কোরিয়া থেকে। এরই পাশাপাশি উনি একজন জাতীয় স্তরের জাজও। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১২ জনেরও বেশি ট্রেইনড্ ও অথরাইজড ব্ল্যাক বেল্টপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক নিয়মিতভাবে তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন এই গান্ধী সেবা সদনের হল ঘরে ও কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে। ২৮ বছর ধরে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণের ফলস্বরূপ এই অ্যাকাদেমির বহু ছাত্রছাত্রী নিয়মিত বিভিন্ন জেলা, রাজ্য থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পদক অর্জন করেছেন। এই সিয়োংস অ্যাকাদেমির বেশ কিছু ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত ছাত্র এই রাজ্যের হয়ে সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৪-তে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ও দুজন ছাত্রী চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৪-তে অংশগ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, দক্ষিণদাঁড়ি

গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৮

ই-মেল: gandhisevasangha1946@gmail.com

কার্যকরী সমিতি ২০১৪-১৬

ক্রম	নাম	পদ	ফোন-ই-মেল
১	শ্রী রঘুনাথ কুণ্ডু	সভাপতি	৯৮৭৪০১৯৭৭৪
২	ডাঃ হিরন্ময় সাহা	কার্যকরী সভাপতি	৯৮৩০১২৪০৭৩
৩	শ্রীমতী মঞ্জু মুখার্জি	সহ-সভাপতি	৯৪৩৩২৬২১৩৫
৪	শ্রী উৎপল কুমার ঘোষ	সহ-সভাপতি	৯০০৭৪৪৪৩৬২
৫	ডাঃ আশিস গাঙ্গুলি	সহ-সভাপতি	৯৮৩০৭২৪৯৯০
৬	শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	সহ-সভাপতি	৯৮৩৬১৩৩৭৬২
৭	শ্রী পৃথ্বীপতি চক্রবর্তী	সহ-সভাপতি	৯৪৩২২২৯৮০১
৮	শ্রী গৌতম সাহা	সাধারণ সম্পাদক	৯৪৩২০০০২৬০
৯	শ্রী বাসুদেব ঘোষ	কোষাধ্যক্ষ	৯৮৩১৩৪৫৯৩৩
১০	শ্রীমতী জবা গুহঠাকুরতা	সহ-সম্পাদক	৯৩৩১৮৯৮৬২৯
১১	শ্রী সুব্রত পাল	সহ-সম্পাদক	৯০৫১৪৬৬৯৩৮
১২	শ্রী রাম অবতার জোশি	সহ-কোষাধ্যক্ষ	৯৩৩১০১৪০৬৮
১৩	শ্রী সুজিত বসু, এম এল এ	সদস্য	৯৮৩০০৫৩৩৪৭
১৪	ডাঃ অসীম চ্যাটার্জি	সদস্য	৯০৩৮৮৩৭১২০
১৫	শ্রী সুভাষ দাঁ	সদস্য	৯৮৩০০৫৮১৩৬
১৬	শ্রী অনুকূল সরকার	সদস্য	২৫২১৮৪৮১
১৭	শ্রী প্রবীর গুহ ঠাকুরতা	সদস্য	২৫৩৪৩৬৫৬
১৮	শ্রী পঙ্কজকুমার দত্ত, আই পি এস (অবসর)		৯৮৩১০৭৯৮৪৪
১৯	শ্রীমতী তপতী গাঙ্গুলি	সদস্য	৯৪৩৩৩১৭২৬৩
২০	শ্রী শম্ভুনাথ বণিক	সদস্য	৯৮৩০০১৭৭৮৭
২১	শ্রীসমীর নন্দী	সদস্য	৯৮৩০৪১৪৫২৭
২২	ডাঃ তাপস কুমার চট্টরাজ	সদস্য	৯৮৩১০৭০০৫০
২৩	শ্রী অনিরুদ্ধ ঘোষ	সদস্য	৯৮৩০১৭৫৪৯৮
২৪	শ্রী শঙ্করলাল ঘোষাল	সদস্য	৯৮৩১৫৬২৩৪৪
২৫	শ্রী ধনঞ্জয় আঢ্য	সদস্য	৯৬৭৪০৬০৪৫০

যে সব জনদরদী ডাক্তাররা আমাদের চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত

ডাঃ ঋর্ণাপাল চৌধুরি (অ্যালোপ্যাথিক)
ডাঃ জয়ন্তী পোদ্দার (অ্যালোপ্যাথিক)
ডাঃ এস এম চক্রবর্তী (হোমিওপ্যাথিক)
ডাঃ অভিজিৎ শূর (অপ্টোমেট্রিস্ট)
ডাঃ সীমা দে (অপ্টোমেট্রিস্ট)

সঙ্ঘের বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত—

শ্রী সুরেশ ধর, শ্রী অনিল চক্রবর্তী, শ্রীমতী দীপা দত্ত, শ্রীমতী গোপা দত্ত, শ্রী সজল বিশ্বাস, শ্রী অপূর্ব দত্ত, শ্রীমতী অঞ্জলি সরকার, শ্রী সুবোধ মাইতি

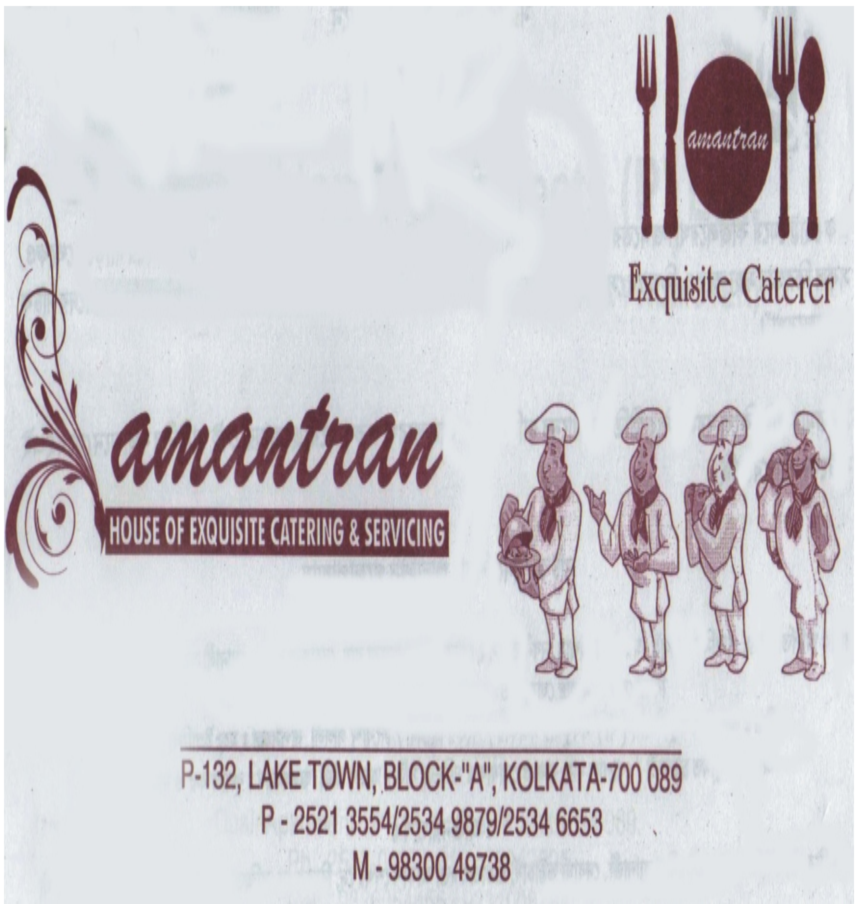

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সিএ-৫/১৩, দেশবন্ধু নগর, বাগুইহাটি, কলকাতা-৫৯ হইতে মুদ্রিত
১ম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা